গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা

রাজ্য বাজেট হতাশাজনক

রাজ্য বাজেট সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারের বাজেট সাধারণ গরিব, খেটে-খাওয়া, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে নানা স্তরের স্কিম ওয়ার্কারদের খুব হতাশ করেছে। সুনির্দিষ্ট ভাতা ১৫,০০০ টাকা ও নানা বকেয়া মেটানোর দাবিতে আশাকর্মীরা গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে কর্মবিরতি পালন করেছেন। কিন্তু তাঁদের ভাতা ৫২৫০ টাকা থেকে মাত্র ১০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বকেয়া সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদেরও ভাতা মাত্র ১০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এই ঘোষণাগুলি হয়েছে অনেকটা ছিটেফোঁটা দয়ার দানের মতো করে এবং তা এঁদের পক্ষে অসম্মানজনক। সব থেকে দুর্দশাগ্রস্ত মিড-ডে মিল কর্মীদের সম্পর্কে কোনও কথা বাজেটে নেই। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন। সুপ্রিম কোর্ট এ দিনেই ২৫ শতাংশ ডিএ এখনই মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশের পর তা কী ভাবে দেওয়া হবে বাজেটে তার পরিষ্কার উল্লেখ নেই। এই বাজেটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনও দিশা নেই। সামান্য বেকারভাতা দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে কিন্তু তা কেন আগস্ট থেকে চালু হবে তাও বোধগম্য নয়। আমরা এই বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করছি।

ভারতীয় কৃষকরা ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি

এক বছরের বেশি টালবাহানার পর ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ চূড়ান্ত হয়েছে। সংসদে কৃষক বিরোধী, জনবিরোধী এবং কর্পোরেট স্বার্থবাহী বাজেট পেশ হওয়ার ঠিক পর পরই এই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার খবর দেশবাসী জানতে পারল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা থেকে। পরিতাপের বিষয়, ভারতের সংসদ অধিবেশন চলাকালীন ভারতবাসীকে এ কথা জানতে হল মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে। অথচ এই চুক্তি ভারতবাসীর একটা বড় অংশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে। বিশেষত, এই চুক্তি ভারতের কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও ঘোষণা করেননি। শুধুমাত্র বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই চুক্তি সম্পর্কে একটা ভাসা ভাসা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেক পরে একটা খসড়ার কথা ভারতীয় কর্তারা বললেও বাস্তবে সেটার রূপ কী, তা আজও কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

এই চুক্তি সম্পর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন দেশের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা বলছেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে এবং আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কিনবে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছিলেন, তা কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। অন্য দিকে জানা যাচ্ছে, আমেরিকা থেকে ভারতে আমদানি করা বিরাট সংখ্যক পণ্যের উপর কোনও শুল্ক থাকবে না। আমেরিকা দাবি করছে ভারত আমদানি শুল্ক কমাবে, অন্যান্য অ-শুল্ক প্রাচীর তুলে দেবে এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর কোনও শুল্ক চাপাবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও দাবি করেছেন ভারত আমেরিকা থেকে ৪৫.৫ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য কিনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

ভারতের কৃষকদের পক্ষে এই চুক্তির একটি মারাত্মক দিক হল, খাদ্যশস্য এবং জেনেটিক্যালি মডিফায়েড সয়াবিন, পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত লাল জোয়ার, বাদাম সহ বেশ কিছু মার্কিন কৃষিপণ্য এ দেশের বাজারে ঢোকার দরজা ভারত সরকার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মার্কিন আধিকারিকরা আশা করছেন, এর ফলে ভারতের সাথে তাদের দেশের কৃষি বাণিজ্যের ১.৩ বিলিয়ন ডলার যে ঘাটতি তা অনেকটা কমে আসবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বলা

সাতের পাতায় দেখুন

বাজেটে জনসাধারণের কোনও আগ্রহ নেই কেন

সঙ্গত কারণেই বাজেট নিয়ে সাধারণ মানুষের এখন আর আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে। যাঁদের নির্দিষ্ট এবং যথেষ্ট পরিমাণ আয় রয়েছে তাঁদের আগ্রহ থাকে শুধুমাত্র কতটা পরিমাণে আয়কর ছাড় তাঁরা পাচ্ছেন তা নিয়ে। এ বার বাজেটে অবশ্য সেটুকুও নেই।

কিন্তু এই আগ্রহ না থাকার কারণ কী? কারণ, সাধারণ মানুষ নিত্যদিন যে সব সমস্যায় জর্জরিত, বাজেটে তার কোনও সমাধান দূরের কথা, সুরাহার ইঙ্গিতটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না। তা হলে বাজেটে কী থাকে? বাজেট মানে মোটের উপর সরকারের আগামী এক বছরের আয়-ব্যয়ের একটা পরিকল্পনা। কোন কোন খাত থেকে কী কী উপায়ে এবং কী কী হারে আয় হবে বা হতে পারে এবং কোন কোন খাতে কী পরিমাণে ব্যয় করা হবে তারই একটা হিসেব সরকার পেশ করে বাজেটে। তাই যদি হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসী বাজেট সম্পর্কে অনাগ্রহী হবেন কেন?

বছরের পর বছর ধরে পেশ হওয়া বাজেট খুঁটিয়ে লক্ষ করলেই স্পষ্ট হবে, সরকার যে আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা বাজেটে পেশ করে তার মূল লক্ষ্য দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নন, দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি। কী করলে শিল্পপতি-পুঁজিপতিরা আরও ভাল ভাবে ব্যবসা করতে পারবে, কলে-কারখানায় উৎপাদন করতে পারবে, উৎপাদিত পণ্য দেশের বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করতে পারবে, বিদেশে রফতানি করতে পারবে, বাজেট কার্যত তারই পরিকল্পনা। তাই গোটা বাজেটে কোথাও জনজীবনের সমস্যা নিয়ে কথা নেই— মূল্যবৃদ্ধি রোধের কথা নেই, বিপুল পরিমাণ বেকার যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কী হবে, তার কোনও পরিকল্পনা নেই, শ্রমিকের যথাযথ মজুরি কিংবা শ্রমসময় নিয়ে কথা নেই, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম কিংবা চাষের অস্বাভাবিক ব্যয় কমানোর কোনও কথা নেই। বিরাট অংশের দেশবাসীর দারিদ্র মুক্তির কথা নেই। এমনকি দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা কিংবা চিকিৎসার যে সংকট আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তা মেটানোর কোনও প্রচেষ্টা নেই।

কাজের সংস্থান নেই

কিন্তু দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য যদি ঠিক মতো চলে, কল-কারখানায় যদি উৎপাদনে জোয়ার আসে তবে তো কর্মসংস্থান আপন নিয়মেই হবে, জনজীবনে উন্নয়নও চুঁইয়ে পড়তে থাকবে, তা আলাদা করে বলার কি সত্যিই প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ, সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা, সরকার অনুগৃহীত অর্থনীতিবিদরা এমন কথাই বলেন

দুয়ের পাতায় দেখুন

■ *কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটে মিড-ডে মিল কর্মীদের চূড়ান্ত বঞ্চনার প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে কলকাতার মৌলালি মোড় অবরোধ করেন এবং বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ান কর্মীরা। সংবাদ চারের পাতায়*

বাজেট ঃ জনসাধারণের আগ্রহ নেই কেন

একের পাতার পর

বটে! যেমন ব্যবসায়ীরা, কলকারখানার মালিকরা বলেন, তাঁদের সমস্ত আয়োজনের উদ্দেশ্য দেশের বেকারদের কর্মসংস্থান। তা হলে বছরের পর বছর অজস্র বাজেটে শিল্পপতি পুঁজিপতিদের ব্যবসা করার, অবাধে মুনাফা করার সমস্ত সুযোগ দিয়েও কর্মসংস্থানের সুযোগ এক ইঞ্চিও বাড়ল না কেন? কারণ তাঁদের বলা কথাগুলির সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। পুঁজিপতিদের অজস্র রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়েও নতুন বিনিয়োগ, নতুন কলকারখানা বাস্তবে হচ্ছে না। যতটুকু হচ্ছে, তা ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ তথা পুঁজিনিবিড়— শ্রমনিবিড় অর্থাৎ কর্মসংস্থান নির্ভর নয়। ফলে নতুন বিনিয়োগ কোথাও হলেও, উৎপাদনের নতুন একটা ক্ষেত্র গড়ে উঠলেও তা সবই প্রযুক্তিনির্ভর। আধুনিক উৎপাদন শিল্প উচ্চ-প্রযুক্তি নির্ভর— কর্মসংস্থান সেখানে নামমাত্র— তা-ও উচ্চ-প্রশিক্ষিতদের জন্য। তার বাইরে বিরাট সংখ্যক বেকারদের তা হলে কর্মসংস্থান ঘটবে কী করে?

বরাদ্দ ছাঁটাই

সামাজিক ক্ষেত্রে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বাজেট ঘোষণার পর বরাদ্দ ছাঁটাই (কোটি টাকায়)

• জল জীবন মিশন	৫০,০০০
• পিএম-আবাস (শহর)	১৫, ২৯৪
• গ্রামোন্নয়ন	৫৩,০৬৭
• নগরোন্নয়ন	৩৯,৫৭৩
• সমাজকল্যাণ	৯,৯৯৯
• কৃষি	৬,৯৮৫
• শিক্ষা	৬,৭০১
• স্বাস্থ্য	৩,৬৮৬

অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে শোষণ সীমাহীন

ফলে বাড়ছে অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রের পরিমাণ। তা নির্মাণ শিল্প হোক বা হোম ডেলিভারি কিংবা গিগ ক্ষেত্র। দেশে এমন অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলির আয়তন দ্রুত হারে বাড়লেও বাজেটে এখানে কর্মরতদের ন্যূনতম মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে একটি কথাও বলেননি অর্থমন্ত্রী। এমনকি তাঁদের কাজের নিশ্চয়তাটিও আইনের দ্বারা সুরক্ষিত নয়— সম্পূর্ণ মালিকের মর্জি-নির্ভর। ফলে সমাজের বড় অংশের শ্রমিক-কর্মচারী আজ দেশে সীমাহীন মালিকী শোষণের শিকার— সেই মালিক দেশি হোক বা বিদেশি। একই রকম ভাবে দেশ জুড়ে বিরাট অংশের যুব সমাজ কাজের সন্ধানে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে ছুটছেন। সেখানে এমনকি তাঁরা ভাষাগত, প্রদেশগত বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও সহায়তা সংক্রান্ত একটি কথাও বাজেটে নেই।

জনকল্যাণ খাতে খরচ ক্রমাগত কমানো হচ্ছে

জনকল্যাণ যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকার নয়, তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাইয়ে। সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো সরকারের লক্ষ্য হিসাবে না থাকায় ২০২৫-২৬ এ সামাজিক ক্ষেত্রে বাজেটে যত বরাদ্দ হয়েছিল তার বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করাই হয়নি। অথচ এমন নয় যে, দেশের মানুষের বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজন সরকার মিটিয়ে ফেলেছে। আজও দেশের বিস্তীর্ণ অংশে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছায়নি। বহু মানুষকেই অনেক দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। সদ্যই মধ্যপ্রদেশে দূষিত জল খেয়ে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে। তা ছাড়া বিশুদ্ধ পানীয় জল সুলভ না হওয়ায় বোতলজাত পানীয় জল কিনে খেতে হওয়ায় সাধারণ মানুষকে এর জন্য ভাল পরিমাণ ব্যয় করতে হয়। সরকারের জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিই এর জন্য দায়ী। একই রকম ভাবে পিএম-আবাস, গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতে এ ভাবেই বিপুল অঙ্কের বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে, বাজেটে বরাদ্দ বলে অর্থমন্ত্রী যা ঘোষণা করেন বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই। তা ছাড়া এই বরাদ্দ ছাঁটাই সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামকে আরও কঠিন করে তুলবে এবং মানুষের কেনার ক্ষমতাকেও আরও নিচে নামাবে।

বঞ্চনার শিকার স্বাস্থ্যকর্মী সহ স্কিম কর্মীরা

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে লক্ষ লক্ষ আশাকর্মী ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরা চূড়ান্ত সরকারি বঞ্চনার শিকার। বাজেটে তাঁদের বঞ্চনা নিরসনে কোনও ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি। সরকারের একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে মিড ডে মিল কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ক্ষেত্রেও।

পুঁজিপতিদের জন্য দরাজ সরকার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'সবার আগে আমেরিকা' নীতির কল্যাণে ভারতীয় পণ্যের উপর বিপুল পরিমাণ কর চাপানোয় ভারতীয় পণ্যের মার্কিন রফতানি প্রবল অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এই অবস্থায় অন্যত্র রফতানি বাড়াতে সরকার রফতানি দ্রব্যে প্রয়োজনীয় উপাদান এবং যন্ত্রাংশ আমদানিতে ব্যাপক ছাড় ঘোষণা করেছে। আমদানি-রফতানিকারী বৃহৎ ব্যবসায়ীদের পুঁজি জোগানোর জন্যও বাজেটে বিপুল বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

পুঁজিপতিদের জন্য পরিকাঠামো গড়ে দিতে এ বার পরিকাঠামো নির্মাণ খাতে ব্যয়বরাদ্দ ১১.৪ শতাংশ বাড়িয়ে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে যেমন ঝাঁ চকচকে হাইওয়ে গড়ে তোলা হবে তেমনই হাইস্পিড রেল করিডর গড়ে তোলা হবে। আর তাতে চুঁইয়ে পড়া কিছু কর্মসংস্থানও হবে। যদিও এই নির্মাণ সবই উচ্চ-প্রযুক্তি নির্ভর। তাই কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নগণ্যই।

ঋণ করে ধনীদের ঋণ শোধ করছে সরকার

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করে না বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই শোধ না হওয়া ঋণের বড় অংশ প্রতি বছর তাদের খাতা থেকে মুছে দেয়।

গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি মোট যত ঋণ দিয়েছে, তার মধ্যে অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ-তে পরিণত হয়েছে ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৪৭ কোটি টাকা। এই বিপুল টাকা ব্যাঙ্ক তাদের হিসাবের খাতা থেকে মুছে দিয়েছে বলে সংসদে গত ৮ ডিসেম্বর এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধরি। সরকার ঋণ করে হলেও এই টাকা ব্যাঙ্কগুলিকে ফিরিয়ে দেয়। এক দিকে যেমন যে টাকা পুঁজিপতিরা লোপাট করে তা জনগণের ঘাম-রক্তের বিনিময়ে জমানো টাকা, তেমনই সরকার যে ঋণ করে এই টাকা ব্যাঙ্কগুলিকে ফিরিয়ে দেয় সে টাকাও শোধ হয় নিরন্ন জনতার ঘাড় ভেঙে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে জমা টাকার পরিমাণ প্রায় ২৩১.৯০ লক্ষ কোটি টাকা যার ৮০ শতাংশেরও বেশি সাধারণ মানুষের।

সরকারকে এ বার খরচ ও রাজস্ব আয়ের ফারাক মেটাতে ১৭ লক্ষ কোটি টাকা ধার করতে হবে। এর মধ্যে ১৪ লক্ষ কোটি টাকাই যাবে মোট ঋণের সুদ গুনতে। আগামী অর্থ বছরে মোট ঋণের পরিমাণ ২১৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে। যা ২০১৪ সালের ঋণের তুলনায় প্রায় চার গুণ।

প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি অর্থনীতির আরও সামরিকীকরণ করতেই

পুঁজিপতি শ্রেণির তীব্র শোষণে দেশের মানুষের কেনার ক্ষমতা যখন তলানিতে পৌঁছে যায়, তখন পুঁজিপতিদের মুনাফা অটুট রাখতে সরকার অর্থনীতির সামরিকীকরণ করে। সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের ছাড়পত্র দেওয়া হয় বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে। কোম্পানিগুলি উৎপাদিত সামগ্রী যেমন নিজেরা রফতানি করে, তেমনই তার বড় অংশ সরকার নিজে কিনে নেয়। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলিরই রমরমা। অন্য দিকে প্রায় সমস্ত বড় বড় কোম্পানিই এখন কোনও না কোনও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বের ছোট-বড় সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই আজ অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথে ছুটে চলেছে। তাই বিশ্বের কোথাও না কোথাও ছোট হোক, বড় হোক যুদ্ধ লেগেই আছে এবং এমন প্রতিটি যুদ্ধেই কোনও না কোনও ভাবে প্রায় সব রাষ্ট্রই যুক্ত হয়ে পড়ছে। তাই কোথাও শান্তির কোনও প্রচেষ্টা নেই। তা সে ইউক্রেনের যুদ্ধ হোক কিংবা প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের হামলা হোক। যে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষে ভারত চিরকাল দাঁড়িয়েছে, এই যুদ্ধে যে তা পারল না তার কারণ এই যুদ্ধে অস্ত্রব্যবসায়ী ভারতীয় কোম্পানিগুলির স্বার্থ সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে। বাস্তবে এই কোম্পানিগুলিই ভারতের বিদেশ নীতি তথা যুদ্ধনীতি যেমন নিয়ন্ত্রণ করছে, তেমনই প্রতিরক্ষা বরাদ্দ তথা বাজেটটিও তাদেরই পরামর্শে প্রস্তুত।

অর্থনীতির এই সামরিকীকরণের নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এ বারের বাজেটে। গত বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের জন্য ধার্য হয়েছিল মোট ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা। এ বার ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বাড়িয়ে করা হল ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা। যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ১১ শতাংশ। এর মধ্যে প্রায় ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা আধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের কাজে ব্যয় করা হবে। এর বাইরেও মূল বাজেট থেকে ১.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হবে নতুন সামরিক সরঞ্জাম কেনার জন্য।

যে কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র দেশ বলতে বোঝে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি আর সীমান্ত বেষ্টিত এক ভূখণ্ডকে। দেশের সাধারণ মানুষকে নয়। তাই সব সময়ই তারা দেশের মানুষকে অভুক্ত রেখে, শিক্ষাহীন, চিকিৎসাহীন অবস্থায় ফেলে রেখে দেশরক্ষার কথা বলে। আর সেই খাদ্যহীন, শিক্ষাহীন, চিকিৎসাহীন দেশবাসীকে দিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে এই বিপুল খরচকে অনুমোদন করিয়ে নিতে চায়। তার জন্য সব সময়ই তারা কিছু কাল্পনিক শত্রু খাড়া করে আর সেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার জুজু দেখায়। তাই সরকারের মন্ত্রীরা, সরকারের অনুগত কলমচিরা, সরকারি অর্থে পুষ্ট বিশেষজ্ঞরা এমনকি প্রতিবেশী প্রতিটি দেশকেই শত্রু প্রতিপন্ন করে তুলে ধরে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে মতপার্থক্যকে প্রচার করতে থাকে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের সম্ভাবনা বলে। সবাই জানে পাকিস্তানের যা অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক শক্তি তাতে ভারতের মতো সামরিক শক্তিশালী একটি দেশকে আক্রমণ করতে সে সহজে সাহস করবে না। ঠিক তেমনই, বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে যার শত্রুতা করার মতো কোনও শক্তিই নেই, সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলি তার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার গল্পও বাতাসে ভাসিয়ে চলেছে। এ সবেরই লক্ষ্য এ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো এবং তাদের উৎপাদিত অস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরকারকে গছিয়ে দেওয়া। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বর্তমানে ভারতের যে বৈরিতা, তার বেশির ভাগটাই বিজেপি সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণে। যে শাসক দল দেশের মানুষকেই ধর্মের ভিত্তিতে, জাতের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, প্রদেশের ভিত্তিতে শত-বিভক্ত করে রাখে, তার কাছে দেশরক্ষা বিষয়ে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা বৃথা।

বৈষম্য বাড়তেই থাকবে

গোটা বাজেট জুড়ে যখন পুঁজিপতিদের জন্য অজস্র উপঢৌকনের ব্যবস্থা তখন জনগণের জন্য বিভিন্ন খাতে যে সামান্য পরিমাণ ভর্তুকিটুকু দেওয়া হত তাকেও ক্রমাগত কমিয়ে আনছে সরকার। বাজেটে খাদ্য, সার এবং জ্বালানির ভর্তুকি কমানোর কথা জানিয়ে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। গত বারের ৪,২৯,৭৩৫ কোটি থেকে এর পরিমাণ ৪.৪৭ শতাংশ কমিয়ে এ বার করা হয়েছে ৪,১০,৪৯৫ কোটি টাকা।

সেই কবে, ১৯৭৪ সালের এক ভাষণে এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলে গিয়েছিলেন, পুঁজিপতি শ্রেণির দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখবার জন্য, পুঁজিবাদকে সংহত ও শক্তিশালী করবার জন্য, পুঁজিবাদকে তার সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য যা যা করা দরকার সেই কাজগুলোই করে থাকে। ফলে আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, জাতীয় পরিস্থিতি, বিশ্ব-পুঁজিবাদী বাজারের সংকটের মধ্যে বর্তমান বাজেটও যে পুঁজিবাদকেই সংহত হতে, তাকে সংকট থেকে বাঁচতে সাহায্য করার জন্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই বাজেট তথা পুঁজিবাদী এই নীতির ফল হিসাবে আগামী দিনগুলিতে দেশে ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য যে গতিতে বাড়ছে তা আরও তীব্র হবে। ধনীদের হাতে আরও বেশি সম্পদ কুক্ষিগত হবে। দরিদ্র আরও বেশি দারিদ্রের মধ্যে তলিয়ে যাবে।

যতক্ষণ না দেশের শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মালিকী ভিত্তিটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী হচ্ছে এবং এই সরকার পাল্টে পুঁজিবাদীদেরই আর একটা সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে নিজেদের শোষণমুক্তি ঘটানোর চিন্তার মধ্যে ভুলটা ধরতে পারছে তত দিন হাজার বাজেটের পরেও মানুষের জীবন-যন্ত্রণাই শুধু বাড়তে থাকবে।

মার্ক্স আবিষ্কার করেছেন মানব সমাজের বিকাশের নিয়ম

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

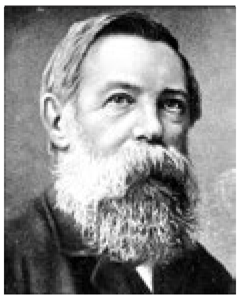

“জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম যেমন আবিষ্কার করেছেন ডারউইন, তেমনই মার্ক্স আবিষ্কার করেছেন মানব-ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম। নানা মতাদর্শের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে এত কাল যা লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, মার্ক্স উদ্ধার করেছেন সেই সহজ-সরল সত্যটিকে— রাজনীতি-বিজ্ঞান-শিল্প-ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করার আগে মানুষের একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন হল খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় আর পরনের বস্ত্র। অর্থাৎ জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক বৈষয়িক উপাদানসমূহের উৎপাদন এবং এক নির্দিষ্ট যুগকালের মধ্যে অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ভিত্তি, যার উপর বিবর্ধিত হয়ে উঠেছে এক-একটি বিশেষ জনসমাজের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইন-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, শিল্প এবং এমনকি ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত— আর সে-কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই উপরোক্ত ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত, এ পর্যন্ত যেমনটা হয়ে এসেছে তেমন উল্টো দিক থেকে নয়।

কিন্তু ওটাই সব নয়। আজকের দিনের পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং এই উৎপাদন পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজকে সৃষ্টি করেছে, উভয়ের গতিশীলতার বিশেষ নিয়মকে আবিষ্কার করেছেন মার্ক্স। উদ্বৃত্ত মূল্যের আবিষ্কার হঠাৎ এমন একটি সমস্যার উপর আলোকপাত করল, যার সমাধান করার জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচকদের পূর্বেকার সকল অনুসন্ধানই ছিল অন্ধকার হাতড়ে বেড়ানোর সামিল।

একজন মানুষের সারা জীবনের পক্ষে এই জাতীয় দুটি আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমন ধরনের একটি আবিষ্কারের সৌভাগ্যও যার হয়, সে মানুষ ধন্য। অথচ যে ক্ষেত্রেই মার্ক্স গবেষণা চালিয়েছেন— বলা বাহুল্য তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রও ছিল বহুবিচিত্র, আর কোনও ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের কাজ তিনি দায়সারা ভাবে করেননি— প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি গণিতশাস্ত্রেও, স্বাধীন সব আবিষ্কার ঘটানোয় সক্ষম হয়েছেন।

এমনই ছিলেন এই বিজ্ঞানী মানুষটি। কিন্তু এটাও মানুষটির এমনকি অর্ধেক পরিচয়ও নয়। মার্ক্সের কাছে বিজ্ঞান ছিল ঐতিহাসিক ভাবে গতিশীল এক বৈপ্লবিক শক্তি। কোনও একটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোনও নতুন তত্ত্বগত আবিষ্কার— হাতে-কলমে যার প্রয়োগের কল্পনাও হয়ত তখনও পর্যন্ত রীতিমতো অসম্ভব ঠেকছে, তাকেই অভ্যর্থনা জানাতে মার্ক্সের যত আনন্দই হোক না কেন, যে আবিষ্কার শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সাধারণ ভাবে ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারাকে সূচিত করত, সে ক্ষেত্রে তাঁর আনন্দ হত সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে আবিষ্কারগুলির বিকাশ এবং মার্সেল দেপ্রের[1] সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহ গভীর মনোযোগে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

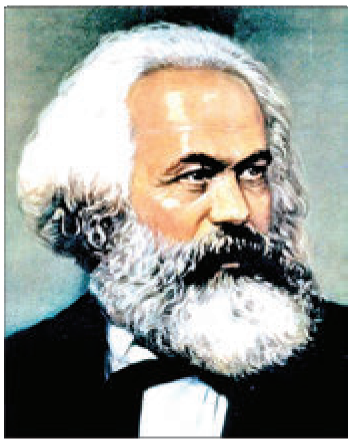

সব কিছুর উপরে মার্ক্স ছিলেন একজন বিপ্লবী। তাঁর জীবনে প্রকৃত লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ও সেই সমাজ যে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে যে কোনও প্রকারে তাদের উচ্ছেদের কাজে অবদান রেখে যাওয়া। আধুনিক যে প্রলেতারিয়েতকে তিনিই প্রথম তাদের নিজস্ব অবস্থান ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন, তার মুক্তির পক্ষে আবশ্যিক শর্তাবলি সম্পর্কে চেতনা দিয়েছিলেন, তাদের শৃঙ্খলমোচনের কাজে অবদান রাখা ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সংগ্রাম ছিল তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য। আর এমন এক প্রচণ্ড আবেগ, নাছোড়বান্দা ভাব আর সাফল্যের সঙ্গে তিনি লড়তেন যার তুলনা ছিল বিরল। রাইনসে জাইতুং প্রথম পর্ব (১৮৪২), প্যারিসের ভোরওয়ার্টস (১৮৪৪), ডয়েৎস-ব্রাসলার জাইতুং (১৮৪৭), নিউ রাইনসে জাইতুং (১৮৪৮-৪৯) ও নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন (১৮৫২-৬১) পত্রিকায় তাঁর কাজ,[2] এ ছাড়াও প্রচুর সংগ্রামী প্রচার-পুস্তিকা রচনা, প্যারিস, ব্রাসেলস ও লন্ডনে সংগঠনগুলোর কাজকর্ম চালানো, পরিশেষে সবচেয়ে বড় ব্যাপার, মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ[3] গঠন— একই সঙ্গে এ সবই নিষ্পন্ন করেছেন তিনি। বস্তুত, শেষোক্ত কাজটি এমনই একটি গৌরবময় কীর্তি যে এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা যদি আর কিছুই না করতেন তবু শুধুমাত্র এই কাজটির জন্যই তিনি গর্বিত হতে পারতেন।

ফলত, মার্ক্স ছিলেন তাঁর কালের সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষের পাত্র, সবচেয়ে জঘন্য কুৎসার নিশানা। একচ্ছত্র রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী উভয় ধরনের গভর্নমেন্টই তাঁকে তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করেছে। রক্ষণশীল অথবা অতিগণতন্ত্রী যা-ই হোক না কেন, বুর্জোয়ারা একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসাবর্ষণে মেতেছে। এ সব কোনও কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি, মাকড়সার জাল বা জঞ্জাল গণ্য করে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনে বাধ্য হলে মাঝেসাঝে জবাব দিয়েছেন— এইমাত্র। সাইবেরিয়ার খনি-অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সকল অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সহকর্মীর ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর শোক নিবেদনের মধ্য দিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, অত্যন্ত জোর দিয়ে এ কথা আমি বলছি যে, হয়তো মার্ক্সের বহু বিরোধী ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর একজনও ছিল না।

যুগ যুগ ধরে স্থায়ী হবে তাঁর নাম, কীর্তিত হবে তাঁর কৃতি!”

১। মার্সেল দেপ্রে (১৮৪৩-১৯১৮) — ফরাসি পদার্থবিদ, দূরান্তরে বিদ্যুৎসঞ্চার প্রণালীর আবিষ্কারক) ২। মার্কস রাইনসে জাইতুং ও নিউ র‍্যানসে জাইতুং নামের পত্রিকা দুটির সম্পাদক ছিলেন এবং উপরোক্ত অন্যান্য পত্রপত্রিকাগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কিংবা বিদেশস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। ৩। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (প্রথম আন্তর্জাতিক)-এর প্রতিষ্ঠা করেন মার্ক্স ১৮৬৪ সালে। এই আন্তর্জাতিক কায়েম থাকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত। এইটিই ছিল প্রলেতারীয় পার্টির প্রথম অঙ্কুর।

১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ কার্ল মার্ক্সের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধার্ঘ্য

হিমন্ত বিশ্বশর্মা, আর কত নিচে নামবেন

বিজেপি দলটি কেমন তার অনেকটাই আন্দাজ পাওয়া যাবে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বক্তব্যে। সম্প্রতি এক প্রকাশ্য সভায় তিনি বিজেপি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে যেতে হবে, যাতে তারা সমস্যায় পড়েন। এখানেই তিনি থামেননি। আরও নানাভাবে যাতে মুসলিমদের হয়রান করা যায়, তার পরামর্শও দিয়েছেন। বলেছেন, বাংলাভাষী মুসলিম রিক্সাওয়ালাদের ন্যায্য ভাড়ার চাইতে কম দিতে। আগেও তিনি হুমকি দিয়েছিলেন বাংলাভাষী মুসলিমদের জমি বিক্রি করা যাবে না, বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাবে না। শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তারা যেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষদের কাজে নিয়োগ না করেন। অর্থাৎ, মুসলিমদের ভাতে মারা এবং হেনস্থার নানা হীন পন্থা তিনি ও তাঁর দল নিয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে মুসলিমদের নাম গণহারে বাদ দিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা প্রকাশ্যে বলেছেন, হাজার হাজার ৭ নং ফর্ম পূরণ করে অভিযোগ দায়ের করতে। একজন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে এ ভাবে বলার পরেও বলতে হবে দেশে আইন কিংবা সংবিধান বলে কিছু আছে?

হিমন্ত বাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সংবিধান মেনে চলার শপথ নিয়েই। যদিও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁর এই হুমকি, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ঘৃণা ভাষণ, দলীয় কর্মীবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা এবং তাদেরকে চাপে ফেলে দেশ থেকে বিদায় করা ইত্যাদি যে হুঙ্কার তিনি দিয়েছেন, তা শুধু অমানুষ সুলভ নয়, সংবিধান বিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী। শোভনতা, ভদ্রতা এ সব কথা বিজেপি নেতাদের প্রসঙ্গে তুলে লাভ নেই! বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ভাষণ এবং উস্কানির জন্য আইনতই তিনি অপরাধী। আসামের পুলিশ আইনের শাসনকে মর্যাদা দিলে শাসক বিজেপির দলদাস হয়ে না থাকলে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করত।

সংবাদে প্রকাশ, আসামের করিমগঞ্জ জেলায় একজন ব্যক্তি একাই ১৩৩ জন ভোটারের নাম কাটার অভিযোগ দাখিল করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, উপযুক্ত তদন্ত ছাড়াই কারও অভিযোগের ভিত্তিতে মৃত বলে স্ট্যাম্প দিয়ে নাম বাতিলের হিড়িক। কর্মরত এক বিএলও- কেও মৃত বলে দেখানো হয়েছে। গোয়ালপাড়ায় ১৪২ জনের নামে নোটিশ আসার পর গ্রামবাসীরা ক্ষেপে গিয়ে সভা ডেকে ওই বুথে বিজেপির বিএলএ-র কাছে এর জবাব চান। জনরোষ আঁচ করে লিখিত বিবৃতিতে ওই দুই এজেন্ট স্বীকার করেন, ১৪২ জন ভোটারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা ছিল। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি আগেই ফাঁকা ফর্ম-৭ গুলিতে এজেন্টের স্বাক্ষর করিয়ে রেখেছিলেন। এইভাবে জালিয়াতি করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এই কারচুপি ধরার পরে এক বিএলও-কে শুধু নির্বাচনী পদ থেকে নয়, শিক্ষক পদ থেকে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি সরকার। দুষ্কর্ম ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ঔদ্ধত্যের সাথে বলেন, ‘সংখ্যালঘু মিঁয়া ভোটারদের কষ্ট দেওয়াই আমার কাজ। যা করেছি বেশ করেছি।’ তিনি মেনেনেন, শুধু বিজেপি কর্মীরাই পাঁচ লক্ষাধিক অভিযোগ জমা দিয়েছে। সমস্ত সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই অপশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি মানবসমাজের কী বিপদ ডেকে আনতে পারে?

ভোটের স্বার্থে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে বিজেপির এই ভয়ানক বিদ্বেষের রাজনীতি তার শক্তির নয়, গভীর সংকটের লক্ষণ। কেন্দ্রে দশ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদির শাসন, বিভিন্ন রাজ্যে তাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার, জনজীবনের মৌলিক সমস্যার কোনও সমাধান করতে পারেনি। বরং সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই অবস্থায় জীবনের সঙ্কট থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘোরাতে মানুষকে নিজের নাগরিকত্বের দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন রাখতে এই হীন পথ নিয়েছে বিজেপি।

এই সাম্প্রদায়িক অপচেষ্টা বন্ধ করতে হলে সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলনের রাজপথেই ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হবে তাঁরা প্রত্যেকেই পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ বঞ্চনার শিকার। এই শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং চেতনাই মানুষকে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করবে। সত্যিকারের বামপন্থীদেরকেই এই সংগ্রামের উদ্যোগ নিতে হবে। আসামের যে সংখ্যালঘু মানুষরা তীব্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী আক্রমণের মুখে, তাঁরা যদি প্রতিক্রিয়া থেকে কোনও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী পাল্টা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হন, সেটা তাঁদের আরও বিপদে ফেলবে। তাই বাড়াতে হবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিকে, আন্দোলনের চেতনাকে। এই আন্দোলনের পথেই চেতনার গণতন্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে পশ্চাৎপদ, সাম্প্রদায়িক চিন্তার মোকাবিলা করা যাবে।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ হরিশ্চন্দ্রপুরে

মিড-ডে মিল কর্মীদের প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি মালদায় হরিশ্চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করে শহিদ মোড় অবরোধ করেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মীর মিছিলে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা সাথী চৌধুরী, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা সম্পাদিকা মাজেদা বিবি এবং আসগুরি খাতুন প্রমুখ। তাঁদের ক্ষোভের কারণ, তাঁরা পরিশ্রম করেও তার মজুরি পান না। এঁদের ১২ মাসের বেতন না দিয়ে ১০ মাসের বেতন দেওয়া হয়। এঁদের জীবনের সুরক্ষাও নেই। অবসরকালীন ভাতাও দেওয়া হয় না। কর্ণাটকে ৪০০০ টাকা, হরিয়ানাতে ৭০০০ টাকা, পণ্ডিচেরিতে ১২০০০ টাকা বেতন মিড ডে মিল কর্মীদের দেওয়া হয়। আর পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া হয় মাত্র ২ হাজার টাকা। আবার এই ২০০০ টাকা অনেকের সাথে ভাগ করে নিতে হয়। বছরের পর বছর সরকারি প্রকল্পের অধীনে কাজ করলেও তাদের সরকারি কর্মী স্বীকৃতি নেই।

১২ মাসের পারিশ্রমিক, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা মাসিক বেতন, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা অনুদান, উৎসবকালীন ভাতা বরাদ্দের দাবি জানান তাঁরা।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের জেলা সম্মেলন

নদিয়া ঃ গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া পিএমপিএআই-এর প্রথম নদিয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৫ জানুয়ারি কৃষ্ণনগরের দ্বিজেন্দ্র মঞ্চে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সত্যজিৎ রায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ডাঃ তিমির কান্তি দাস, বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবতোষ ভৌমিক, ডাঃ অরূপ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ। সম্মেলন থেকে ডাঃ অপূর্ব রায়কে সভাপতি এবং লক্ষ্মণ শর্মাকে সম্পাদক ও দিলীপ চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ, নরেশ সরকারকে অফিস সম্পাদক করে নদিয়া জেলা কমিটি গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম ও শহরের সাড়ে তিন শতাধিক ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার।

জলপাইগুড়ি ঃ পিএমপিএআই জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম কনভেনশন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হল ২৮ জানুয়ারি ধূপগুড়ির নেতাজিপাড়া বীরেন্দ্র ভবনে। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট গ্রামীণ চিকিৎসক কৃষ্ণপদ রায়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মানস কর। কনভেনশন থেকে সন্তর আলিকে সভাপতি, সান্ত্বনা রায় ও বাপ্পা রায়কে যুগ্মসম্পাদক করে ৩০ জনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি গঠিত হয়

ঝাড়গ্রাম ঃ ১ ফেব্রুয়ারি পিএমপিএআই-এর প্রথম ঝাড়গ্রাম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ঝাড়গ্রাম শহরে আইএমএ হলে।

প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ তরুণ মণ্ডল। জেলার আটটি ব্লক থেকে প্রায় ২২৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সীতারাম মাহাতোকে সভাপতি, দয়াময় দাশগুপ্তকে সম্পাদক, সুজিত খাটুয়াকে কোষাধ্যক্ষ এবং তারাপদ সিংহ ও অমল কুমার দাসকে যুগ্ম অফিস সম্পাদক করে ৪৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

আমার নাম মহম্মদ দীপক কুমার

- নাম কী?
- মহম্মদ দীপক কুমার।
- মহম্মদ দীপক কুমার আবার কারও নাম হয় নাকি?
- আমার নাম জেনে তোমার কী হবে?

এবার কড়া জবাব দীপকের।

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসেই একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী (বজরং দলের সদস্য) হানা দিয়েছিল উত্তরাখণ্ডের কোটদ্বার শহরে ৭০ বছরের ওয়াকিল আহমেদের দোকানে। কেননা তাঁর দোকানের নাম 'বাবা স্কুল ড্রেস অ্যান্ড ম্যাচিং সেন্টার'। গেরুয়া বাহিনীর ফরমান, 'বাবা' মানে হয় বয়স্ক ব্যক্তি, না হয় 'সাধু' বা 'ধার্মিক পুরুষ'। তাই অনেকে হিন্দু ভেবে ভুল করে একজন মুসলমানের দোকানে চলে আসছে। তাদের মতে সেটা অবৈধ। তাই হুমকি— দোকানের নাম পাল্টাতে হবে, না হলে দোকানিকেই তাঁর ধর্ম পাল্টাতে হবে। ফতোয়া শুনে যখন বৃদ্ধ দোকানি কী করবেন বুঝতে পারছেন না, তখন এগিয়ে এলেন স্থানীয় যুবক দীপক কুমার। সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করলেন গেরুয়া বাহিনীকে। তিরিশ বছরের পুরানো দোকানের নাম বদলাতে হবে কেন? হিন্দুত্ববাদীরা কি নিজেদের বাবার নাম বদলে ফেলবে? 'বাবা' শব্দটি হিন্দু শব্দ নয়, মুসলমানরাও 'বাবা' শব্দ ব্যবহার করেন। তা হলে কেন দোকানের নামে 'বাবা' শব্দ রাখা যাবে না? দীপকের প্রশ্নবাণেই ওয়াকিল আহমেদের দোকান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় উন্মত্ত বাহিনী। দীপকের এই সাহসী উদ্যোগে সাথে ছিলেন তাঁর বন্ধুরা এবং অন্য দোকানদাররাও। তাঁরাও ধর্মে হিন্দু। দীপকের মতো বিজয় রাওয়াত-ও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হুমকির তীব্র বিরোধিতা করেন।

কিন্তু ঘটনার শেষ এখানেই নয়। সেদিন দীপক ও তাঁর সহযোগীদের প্রতিরোধের সামনে ফিরে গেলেও ঠিক পাঁচ দিন পরে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ' দেড়েক লোক নিয়ে তারা ফিরে আসে। সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারা দীপকের জিমের সামনে গিয়ে হুমকি দিতে থাকে। বিজেপি নেতা তথা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামী 'হেট স্পিচ' বা 'ঘৃণা ভাষণ' দেওয়ার কাজে ২০২৫ সালে ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সরকারের পুলিশ হামলাবাজদের 'নিরাপত্তা'র অজুহাতে দীপককেই থানায় নিয়ে যায়। সেখানে গেরুয়া বাহিনী দীপকের নামে এফআইআর দায়ের করে। সেই অভিযোগপত্রে দীপকের নাম-ঠিকানা সবই আছে। কিন্তু দীপকের দায়ের করা এফআইআর-এ কারও নাম রাখতে দেওয়া হয়নি। কেবল কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হিসাবে বজরং দলের সুপরিচিত কর্মীদের আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কারা সেই হামলা করেছে। ওয়াকিল আহমেদের দায়ের করা এফআইআর-এ অবশ্য দুজনের নাম আছে, কিন্তু তাদের সাথে আর যারা এসেছিল তাদের 'অজ্ঞাতপরিচয়' বলে দেখানো হয়েছে। বজরং দলের যে কর্মীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছিল, তাদেরও 'অজ্ঞাতপরিচয়' বলে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কোটদ্বার শহরে সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মীদের প্রবেশ অঘোষিত ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এসব করেও দীপককে ভয় দেখানো যায়নি। তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন ঃ 'আমি হিন্দু নই, মুসলিম নই, শিখ নই, খ্রিস্টানও নই। আমি একজন মানুষ। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদের সকলকে— আমার ভাই, বোন এবং বন্ধুদের এটা বলতে চাই যে আমাদের দেশের প্রয়োজন ঘৃণা নয়, ভালবাসা এবং স্নেহ।

এই উত্তরাখণ্ডেই 'চারধাম যাত্রা'র সময় জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মুসলমান দোকানদারদের দোকান। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে 'মহা কুম্ভমেলা'র সময় দোকানে দোকানে ধর্মীয় পরিচয় লিখতে বাধ্য করা হয়েছিল। বিজেপি ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এরকমই ঘৃণার চাষ করে চলেছে। সেই ঘৃণার বিষে আচ্ছন্ন হয়ে অনেক জায়গায় ডেলিভারি বয়দের পরিচয় মুসলিম জেনে অর্ডার বাতিল করতে দেখা গেছে। ড্রাইভার বা যাত্রীর ধর্মীয় পরিচয় জানার পরে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে। আজ দরকার 'মহম্মদ দীপক কুমারের' মতো সাহসী যুবক-যুবতীর, যাঁরা ফ্যাসিস্ট বাহিনীর চোখে চোখ রেখে রুখে দাঁড়াবেন।

কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে মিড ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি শূন্য

৫ ফেব্রুয়ারি পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে স্কিম ওয়ার্কারদের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত মিড-ডে মিল কর্মীদের জন্য একটা শব্দও উচ্চারণ করা হয়নি। এই কর্মীরা সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে ছাত্র-ছাত্রীদের খাবার পরিবেশন করেন। তাঁদের বেতন মাত্র ২০০০ টাকা। বিভিন্ন জায়গায় সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলো কাজ করার দরুণ এই টাকা তাঁদের ভাগ করে নিতে হয়। রাজ্যে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মিড-ডে মিল কর্মী কাজ করেন। কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে, সেখানেও এই কর্মীদের পারিশ্রমিকের কোনও উল্লেখ নেই।

রাজ্য ও কেন্দ্রের এই সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ অবরোধ হয়। কলকাতায় মৌলালি মোড় ও শিয়ালদা চত্বরে মিড-ডে মিল কর্মীরা দফায় দফায় অবরোধ করেন। অবরোধে যুগ্ম রাজ্য সম্পাদক নীলাঞ্জনা কর বলেন, অবিলম্বে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি না করলে কাজ বন্ধ রেখে কর্মীরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন। এ ছাড়া বাঁকুড়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন শহরে মিড-ডে মিল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান এবং বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ান।

কৃষক ও খেতমজুরদের নানা দাবিতে কলকাতায় সমাবেশ

অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠনের ডাকে ২৮ জানুয়ারি কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হল সমাবেশ। উপস্থিত ছিলেন দু'হাজারেরও বেশি কৃষক ও খেতমজুর। উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত

করা, কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, নয়া বীজ বিল ২০২৫ বাতিল, বিদ্যুৎ বিল ২০২৩ প্রত্যাহার, ভিবিজি-রামজি নামে গ্রামীণ মজুরদের, বিশেষ করে জব কার্ডধারী মজুরদের কাজের অধিকার হরণকারী আইন প্রত্যাহার, জব কার্ডধারী মজুরদের বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরি, মধ্য-নিম্ন কৃষকের খেতে জবকার্ডধারীদের ১০০ দিন কাজ করানো, ষাটোর্ধ্ব গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন, সারের ব্যাপক কালো বাজারির বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, পাট্টাপ্রাপ্ত জমির দ্রুত রেকর্ড করা এবং পাট্টা বাতিল করে জমির মালিকের হাতে ওই জমি ফিরিয়ে না দেওয়া, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত রুখে দেওয়া ইত্যাদি দাবি নিয়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের শুরুতে ২১ জানুয়ারি আশাকর্মীদের উপর যে বর্বর পুলিশে জুলুম চালানো হয়েছে তার নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। তা ছাড়া ২৭ জানুয়ারি রাত্রে নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদে মোমো কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত শ্রমিকদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং নিহত ও আহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

প্রধান বক্তা এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, শ্রেণি চেতনার ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মানুষকে মুক্ত করা যায়। এটাই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করেন। বলেন, নির্বাচন আসবে, সরকার পরিবর্তন হবে কিন্তু মূল সমস্যা সমাধান হবে না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অতীতের কংগ্রেস সরকারের মতো চাষিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েও দাবি মানেনি, এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান রাজ্য সরকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সারের কালোবাজারি চলতে দিচ্ছে। চাষিরা দ্বিগুণ দামে সার কিনতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্য সরকার ধান চাষিদের কাছ থেকে নামেমাত্র পাঁচ কুইন্টাল ধান কিনছে অথচ প্রত্যেক ধান চাষির কাছ থেকে কেনার কথা কমপক্ষে ৩০ কুইন্টাল। রাজ্যে রাজ্যে কৃষকদের উচ্ছেদ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃষি জমি দখল করে কর্পোরেট কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে কৃষকরা লড়াই গড়ে তুলছে। তাই চাই শ্রমিক কৃষকের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। সমাবেশে আন্দোলন সংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপন করে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভায় সংগঠনের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড কুমুদ মাহাতো বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড পঞ্চানন প্রধান।

বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর ঘৃণাভাষণের তীব্র নিন্দায় এস ইউ সি আই (সি)

আসামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী এবং আরএসএস-বিজেপির যৌথ উদ্যোগে অব্যাহত বিষাক্ত ঘৃণামূলক প্রচারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দলের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, আপার আসামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের ওপর সম্প্রতি যে আক্রমণের ঘটনা ঘটছে তা রাজ্যের ভয়াবহ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছবিকেই তুলে ধরে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, এই কঠোর পরিশ্রমী দরিদ্র মানুষরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র পরিশ্রমী মানুষের উপর আক্রমণ কেবল অবৈধই নয়, অমানবিকও। এই অবিরাম ঘৃণার প্রচারে কেবল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ধ্বংস করবে না বরং রাজ্যের অর্থনীতিতেও এর খারাপ প্রভাব পড়বে। বলা বাহুল্য যে, এক শ্রেণির দরিদ্র মানুষ কখনও অন্য শ্রেণির দরিদ্র মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না বরং সাধারণ শত্রু, নিপীড়কের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়েই তাদের ঐক্য আরও শক্তিশালী হয়। রাজ্যের জনগণকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে এবং জনবিরোধী শক্তির চক্রান্তকে পরাজিত করতে দরিদ্র পরিশ্রমী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন দলের নেতৃবৃন্দ।

অঙ্কিতা ভাণ্ডারি হত্যার ন্যায়বিচারের দাবিতে সভা উত্তরাখণ্ডে

অঙ্কিতা ভাণ্ডারি হত্যার ন্যায়বিচারের দাবিতে উত্তরাখণ্ডের শ্রীনগর গাড়ওয়ালে সম্প্রতি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রামনগর, দেরাদুন, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে উপস্থিত মানুষ প্রকৃত খুনিদের কঠোর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন। উল্লেখ্য, অঙ্কিতা ভাণ্ডারি ছিলেন এক বিজেপি নেতার হোটেলের কর্মী। মালিকের কথা মতো রাজ্যের শাসক দল বিজেপির কয়েকজন হোমরাচোমরা ব্যক্তিকে সঙ্গ দেওয়ার অশালীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে তাঁকে খুন করা হয়। উত্তরাখণ্ড মহিলা মঞ্চ, এআইএমএসএস, মহিলা একতা মঞ্চ, এআইডিএসও, শ্রীনগর সিটিজেন্স ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এই সভা হয়।

আশাকর্মীদের দাবি মানুন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এআইইউটিইউসি-র

আশা ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি মেনে নেওয়ার দাবি জানিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আশাকর্মীদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। আশা ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা মাসিক বেতন ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা, ইনসেনটিভ সহ সকল বকেয়া টাকা অবিলম্বে প্রদান সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে কর্মবিরোতি করেছেন। এ ছাড়াও তাঁরা অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত দাবি মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে বারবার পেশ করেছেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

চিঠিতে সংগঠন বলেছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের বারবার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করলেও তাঁদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি মেনে নেওয়া হয়নি।

এআইইউটিইউসি দাবি জানিয়েছে সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি সহ সমস্ত দাবি মানার জন্য রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশে এআইইউটিইউসি-র শিক্ষাশিবির

এআইইউটিইউসি-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ভোপালে শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হল। পরিচালনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড স্বপন ঘোষ ও কমরেড অরুণ কুমার সিং এবং সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর সিনহা। ভোপাল, গোয়ালিয়র, গুনা, দেওয়াস, অশোকনগর, ইন্দোর, খণ্ডওয়া ইত্যাদি জেলা থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শামিল হন। শিবির থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

ডিএ সংক্রান্ত রায় সম্পর্কে এআইইউটিইউসি

৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট ডিএ সংক্রান্ত যে রায় দিয়েছে সে বিষয়ে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আবারও প্রমাণ করল ডিএ কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত অধিকার। সুপ্রিম কোর্ট শুধু আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে বকেয়া ডিএ-এর ২৫ শতাংশ দেওয়ার নির্দেশ রাজ্য সরকারকে দেয়নি, বাকি ৭৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠনও করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছেন, সর্বভারতীয় কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স অনুযায়ী ডিএ দিতে হবে। তিনি বলেন, সামগ্রিক ভাবে এই রায় রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক সহ সকল ডিএ প্রাপকদের দীর্ঘ আন্দোলনের জয়। আন্দোলনরত কর্মীদের পাশে আমাদের সংগঠন এআইইউটিইউসি প্রথম থেকেই ছিল, আছে ও থাকবে। আমরা আলাদা ভাবেও এই দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। ফলে এই জয়ের ফলে রাজ্যের শ্রমিক ও কর্মচারীদের আন্দোলন আরও বেগবান হবে। কিন্তু শুধু আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে নয়, এই রায় সম্পূর্ণ ভাবে কার্যকর করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করে জারি রাখতে হবে।

পাঠকের মতামত

বাতাসে পোড়া লাশের গন্ধ

প্রজাতন্ত্র দিবসের রাতটা কালো হয়ে গেল এ দেশের নাগরিক তথা শ্রমিকের দেহ পোড়া ধোঁয়ায়। আনন্দপুরের নাজিরাবাদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বহুজাতিক সংস্থা ওয়াও মোমো ও পুষ্পাঞ্জলি ডেকরেটরের গুদাম। দেহ নয়, দেহাংশে পরিণত মানুষগুলির সঠিক সংখ্যা কত কে বলবে! পুলিশের খাতায় মৃত আর নিখোঁজ মিলিয়ে সংখ্যা একটা লেখা আছে বটে। তবে সেটা যে সঠিক নয়, বলবে যে কেউ।

নিখোঁজের তালিকা যদি আরও দীর্ঘ হয় কিংবা তারা যদি আর কখনও ফিরে না আসেন তা হলে কেউই যে বিস্মিত হবেন না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এই অগ্নিকাণ্ডে যাঁরা প্রাণ হারালেন তাঁরা সকলেই শ্রমিক, আমাদের সহনাগরিক। যে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে, আগুনের লেলিহান অগ্নিশিখায় একটু একটু করে পুড়তে, পুড়তে তাঁরা নির্মম মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হলেন এমন মৃত্যু কি তাঁদের পাওনা ছিল? চোখের সামনে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যারা সাহায্যের কাতর আবেদন করলেন অথচ কোনও সাহায্যই পেলেন না, তার দায় কি বেসরকারি খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থার কেতাদুরস্ত আধিকারিকেরা, মালিকরা এড়িয়ে যেতে পারেন? একটা ছোট বিবৃতি, সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ, প্রতিশ্রুতি আর এর ওর ঘাড়ে দোষ চাপালেই কি দায় ঝেড়ে ফেলা যায়? অগ্নিনির্বাপণের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা তো দূরের কথা, নিয়ম মেনে যা যা করার কথা, তার কোনও ব্যবস্থাই তারা করেননি। এখানেই শেষ না। অভিযোগ উঠেছে রাতে চুরি ঠেকানোর অজুহাতে গুদামের ভেতরে শ্রমিকদের ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ রাখা হত। কোনও সভ্য দেশে শ্রমিকদের সাথে এমন বর্বর আচরণ করা যায়?

এই ভয়াবহ ঘটনায় দেশের শ্রমিকদের উপর শোষণের নির্মম ছবিটাই কি ফুটে ওঠে না? সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নেশায় মত্ত মালিক গোষ্ঠী শ্রমিক সুরক্ষাকে কার্যত জলাঞ্জলি দিয়ে এতগুলো মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনও উপায় কি আছে? দেশের সরকার, রাজ্যের সরকার, স্থানীয় পৌরসভা, দমকল দফতর কেউ কি এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে?

দেশে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার দোহাই দিয়ে যে ভাবে নতুন পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য আইনে পরিদর্শক ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হয়েছে, স্ব-প্রত্যয়ন ও ব্যক্তিগত অডিটের কথা বলে যে ভাবে আইন লঙ্ঘনকারী মালিক পক্ষকে অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা থেকে গেছে খাতায়-কলমে। যার প্রতিফলনে কলকারখানা,খনি, নির্মাণ শিল্প সহ একাধিক শিল্পক্ষেত্রে একের পর এক দুর্ঘটনা ও মৃত্যু মিছিল ঘটে চলেছে। সরকারি তথ্য বলছে প্রাথমিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে ভারতে শিল্পক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে তিন জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রাষ্ট্র কি তার নৈতিক দায় কোনও ভাবে এড়িয়ে যেতে পারে?

কলকাতা পুলিশের এলাকা থেকে কার্যত ঢিল ছোড়া দূরত্বে জলাজমি ভরাট করে যে ভাবে গুদামঘর তৈরি করা হয়েছে, রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে শাসক দলের সাথে বিশেষ লেনদেনের ব্যবস্থা না থাকলে এ কাজ করা যে কোনও ভাবেই সম্ভব না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে দুটি গুদামেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং ফায়ার লাইসেন্স ছিল না। ছিল না জরুরি নির্গমন পথ। কারখানায় রাত্রিবাসের জন্য যে সুরক্ষা ও আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলা দরকার তাও মানা হয়নি। এই সব তথ্য থেকে পরিষ্কার যে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে গাফিলতি ছিল কিংবা সব জেনেও তারা না জানার ভান করে থেকেছেন। তাই শুধুমাত্র লোক দেখানো গ্রেফতারি আর ক্ষতিপূরণ দিয়েই রাজ্য সরকার তার দায় এড়িয়ে যেতে পারে না।

আর কত দিন আমরা আমাদের সহ নাগরিকদের এমন নির্মম পরিণতি দেখেও উদাসীন থাকব, নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলব? শুধুমাত্র গল্পে, আড্ডায় এই নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেই কি আমরা দায় মুক্ত হতে পারি? আমরা কি তত দিন পর্যন্ত নীরব থাকব যত দিন না আমাদের পরিচিত মানুষ জন এমন ঘটনার মধ্যে পড়ছেন? আমাদের উদাসীনতা, আমাদের নীরবতাই কি পরোক্ষে মালিক শ্রেণির, শাসক পক্ষের দায়মুক্তির পথ প্রশস্ত করছে না? আর কত নির্মম মৃত্যুর সাক্ষী হলে তবে আমরা গর্জে উঠব, শাসকের চোখে চোখ রেখে চিৎকার করে বলতে পারব— এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না!

জিশু সামন্ত
খানাকুল, হুগলি

শ্রমিকের প্রাণের দাম নেই

শ্রম, যাকে ভিত্তি করে আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার করি তা মানুষের বুদ্ধির এবং দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যে শ্রমিক এই সম্পদ সৃষ্টি করে ব্যক্তি মালিকানাধীন সমাজ ব্যবস্থায় সেই শ্রমিক যে শুধু যথার্থ শ্রমের মূল্য পায় না তা নয়, পাশাপাশি আজ তার কর্মক্ষেত্রে জীবনের মূল্যও নেই বললেই চলে।

প্রায় প্রতিদিন আমাদের দেশে কোথাও না কোথাও মর্মান্তিকভাবে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে। কখনও বৃহৎ অট্টালিকা, জাতীয় সড়ক বা ব্রিজ তৈরি, কিংবা কলকারখানায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু, অথবা সম্প্রতি কলকাতার কাছে নরেন্দ্রপুরে ওয়াও মোমো কারখানায় ২৭ জন শ্রমিকের নির্মম মৃত্যু এর জ্বলন্ত নিদর্শন। ভারতে বিগত কয়েক বছরে কলকারখানায় দুর্ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, গত বছর তেলেঙ্গানা থেকে শুরু করে তামিলনাড়ু সহ বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক মৃত্যুর ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে।

অপর দিকে শুধুমাত্র মালিকের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কেন্দ্রের সরকার ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইন বাতিল করে, চারটি শ্রমকোড এনেছে। যা চূড়ান্ত ভাবে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়টি ইতিমধ্যেই শিথিল করা হয়েছে, নিরাপত্তা বিধি থেকে যে কোনও কলকারখানাকে ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে।

আগের মতো শ্রম আধিকারিকরা যে কোনও সময়ে কোনও কলকারখানা পরিদর্শন করতে পারবেন না, কলকারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি পাওয়া গেলেও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবেন না, ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২ ঘণ্টা কাজ চালু করা, শ্রমিকদের নিজস্ব দাবি-দাওয়াকে ভিত্তি করে ইউনিয়ন করার অধিকার খর্ব করা সহ নানা শ্রমিক বিরোধী নীতি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। যার যাঁতাকলে প্রতিদিন শ্রমিকরা মালিকের দ্বারা অত্যাচারিত ও লুণ্ঠিত হচ্ছে, জীব-জন্তুর মতো বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছে। যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জয়গান করতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুণ্ডপাত না করে জলগ্রহণ করেন না— সেই সব বুদ্ধিজীবীরা স্বীকার করুন আর নাই করুন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে শ্রমিকের প্রাণের কোনও দাম নেই, তা প্রতিদিন নানা ঘটনায় স্পষ্ট হচ্ছে।

অর্ঘ্য প্রধান
পূর্ব মেদিনীপুর

গণদাবী বুকস্টলে বসে যা দেখলাম

২২ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলার ৪৯তম বাৎসরিক আয়োজন হয়ে গেল সল্টলেকের করুণাময়ীতে। ১৩টি দেশের স্টল সহ কমবেশি প্রায় ১৮০০-র উপর বুক স্টল ছিল এ বারের বইমেলায়।

এর মধ্যে গণদাবী স্টল ছিল ৫৬৩ নম্বরে। এখানে দশ দিন আট ঘণ্টা করে মানুষের আসা-যাওয়া দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের যে ভিড় প্রত্যক্ষ করলাম তা এক কথায় অনবদ্য। বই, যা কি না অজানাকে জানবার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, সেখানে ভিড় মানে তো অনুসন্ধিৎসু মানুষেরই ভিড়। আমার উপস্থিতির দিনগুলোয় দিনে দশ হাজার থেকে আঠেরো হাজার টাকার বই স্টল থেকে সংগ্রাহকদের হাতে পৌঁছেছে। যে বইগুলোর বিনিময় মূল্য মাত্র ১০ টাকা থেকে ৫০, ৬০ টাকার মধ্যে। ১০০ বা তার বেশি মূল্যের বইও ছিল, কিন্তু তার সংগ্রহকারীর সংখ্যা ততটা নয়। এ তো গেল মূল্যমান উপস্থাপনায় একটা বিষয়কে অনুমানে প্রতীয়মান করার চেষ্টা মাত্র। এর সঙ্গে আরও যা দেখেছি তা মনে রাখার মতো। লাল কাপড়ে সজ্জিত স্টল, ভিতরে ঢুকলেই মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ ও শিবদাস ঘোষের কোটেশন সংবলিত ছবি। এ সব দেখে সদ্য কলেজে পা রাখা ছাত্রছাত্রীর দল, এক একটা বই হাতে নিয়ে উপস্থিত কর্মীদের সাথে কথোপকথন, উজ্জ্বল চোখমুখে অনন্ত জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি, এ সবই নিবিড় ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের যে ভলান্টিয়ার সংগ্রহকারীদের সহায়তা করছিলেন, তাঁরাও সংগ্রহকারীকে একের জায়গায় তিন বা চার-পাঁচটি বই সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করেছেন। মনে মনে প্রশ্ন করেছি, এরা কারা? এই যে প্রচারের আলোয় মানুষকে বিভ্রান্তিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রচারমাধ্যমগুলো, তারা যে স্রোতটি সৃষ্টি করে, তার শক্তি তো কম নয়! তা হলে এরা কারা? এরাই কি সেই অনন্তশক্তিময় যৌবন, যাকে 'যা ইচ্ছে তাই' দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না? এরাই কি অন্ধকারের মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের রূপোলি রেখা? রাস্তার ধারে পুজো প্যান্ডেলের পাশে বইয়ের স্টলে থেকেছি, সেই ভিড়ে ভেসে যাওয়া যৌবনের কথোপকথনের শব্দচয়ন প্রত্যক্ষ করেছি। শ্লীলতার অপঘাত মৃত্যু দেখেছি। বইমেলার ভিড়ও দেখলাম। অযথা ঠেলাঠেলির বদলে সযত্নে একজন আর একজনকে পথ করে দিচ্ছেন দেখেছি। কোনও স্টলে কোনও একটা বই হয়তো বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রচারে এসেছে, তা সংগ্রহের জন্য লম্বা লাইন দেখেছি, কোথাও কোনও অসন্তোষ নজরে বা কানে আসেনি।

- ২ জানুয়ারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ফোর্থ ইয়ারের এক ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের বই এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) স্টলে তার বন্ধুকে দেখাচ্ছেন। 'মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' বইটি হাতে নিলেন। 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি নিতে বলায় উত্তরে বললেন, ১৪ বছর বয়সে আমি তা পড়ে ফেলেছি। বাবার হাত ধরে আপনাদের স্টল থেকেই বইটি কিনেছিলাম। বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে আপনাদেরই সঠিক এবং আদর্শবাদী দল বলে আমার মনে হয়। তাই বন্ধুকেও নিতে বলছি। বই নিয়ে যাচ্ছি, পড়ব আপনাদের সাথে ভবিষ্যতে দেখা হবে।
- এক ছাত্রী এস ইউ সি আই (সি)-র স্টলে এসে বলল, মার্ক্সবাদের উপর বই দিন। ভাই উচ্চমাধ্যমিক দেবে, আসতে পারেনি, আমাকে বই নিয়ে যেতে বলেছে। ভাইকে ফোনে ধরিয়ে দেয়। আমি বললাম এটা এসইউসিআই (সি) দলের স্টল। ছাত্রটি আমায় বলল, দেড়শো টাকার মধ্যে মার্ক্সবাদের উপর যা যা বই আছে আমায় দিন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর আপনাদের সাথে এই বইগুলি নিয়ে আমার কথা হবে।

সর্বোপরি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ এবং তরুণ ছাত্রছাত্রীর এই ভিড় এক স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে প্রেরণা দিচ্ছে, এ কথা না ভাবার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

আশীস বসু, চেতলা, কলকাতা

রাজ্য বাজেট ঃ জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের কোনও ভাবনাই নেই

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় ৫ ফেব্রুয়ারি যে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বা ভোট অন অ্যাকাউন্টস পেশ করেছেন, তাতে আগামী এক বছরের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা না হোক, অন্তত রাজ্য সরকারের বিগত এক বছরের সাফল্য-ব্যর্থতা এবং আগামী সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত একটা আর্থিক পরিকল্পনা থাকার কথা। পরিসংখ্যান সহ রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণ, জনসাধারণের উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে কত টাকা লাগবে ও তা কোন কোন ক্ষেত্র থেকে সরকার কি ভাবে সংগ্রহ করবে, সে সংক্রান্ত বিশদ বিশ্লেষণ বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতার মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীর জানার কথা।

কিন্তু এ সব বাদ দিয়ে ইদানীং বাজেট বক্তৃতা হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু ফাঁকা কথার ফুলঝুরি। সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেটও এরই উদাহরণ হয়ে থাকল। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় পেশ হওয়া বাজেটে রাজ্যের অর্থনীতির হাল-হকিকতের তথ্যনিষ্ঠ কোনও ছবি দেখতে পাওয়া গেল না। শোনা গেল না পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির বেহাল দশা ঘোচানোর উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনার কথা। তার বদলে অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সরকারের সাফল্যের বেশ কিছু দাবি বিধানসভায় উপস্থিত করলেন যেগুলির বাস্তব ভিত্তি তো নেই-ই, নেই তথ্য কিংবা পরিসংখ্যানের কোনও সমর্থনও। দাবি করা হল রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থান হয়েছে, শিল্প পরিকাঠামোর বিকাশ ঘটানো হয়েছে দ্রুত গতিতে এবং কাজ পাওয়ার লক্ষ্যে বেকারদের প্রশিক্ষণেও গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এ সব যে নেহাত কথার কথা, বেকার সমস্যায় জর্জরিত রাজ্যের ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রেই জানেন। দাবির পক্ষে তথ্য পরিবেশন করার প্রয়োজনও বোধ করেননি মন্ত্রী মহাশয়া। বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে উঠে আসেনি স্কুল, হাসপাতাল সহ সরকারি দফতরগুলিতে শূন্য পড়ে থাকা অসংখ্য পদ পূরণের কোনও পরিকল্পনার কথাও।

আসন্ন বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে এবারের বাজেট বক্তৃতাকে সুচারু ভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। ভোটবাক্সে সমর্থনের বন্যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য ঢালাও অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাজেটে। মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকা বাড়ানো থেকে শুরু করে বেকার যুবকদের জন্য অনুদান, খেতমজুরদের হাতে টাকা তুলে দেওয়া, সিভিক ভলান্টিয়ার, পার্শ্বশিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের ভাতা সামান্য হলেও বাড়িয়ে দিয়ে যেন সকলকেই খুশি করতে চেয়েছে সরকার।

কিন্তু এ যেন সরকারের দয়ার দান। এই সরকার যদি রাজ্যের খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনমান উন্নত করতে সত্যিই আগ্রহী হত, তা হলে বাজেটে তার ছাপ থাকত। তার বদলে মানুষের হাতে কিছু নগদ টাকা গুঁজে দেওয়ার ব্যবস্থা করল তারা, যার মধ্যে গরিব-মেহনতি মানুষের প্রতি দরদের চিহ্নমাত্র নেই। আশাকর্মীদের মতো স্কিমকর্মীদের কথাই ধরা যাক। রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে বলে বাজেট ভাষণে সাফল্য দাবি করেছেন মন্ত্রী। অথচ এই সাফল্যের কারিগর আশাকর্মীরা দীর্ঘ দিন ধরে ভাতা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের মাত্র মাসিক এক হাজার টাকা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে বাজেটে। একই ভাবে মিড-ডে মিল, যা সরকারি স্কুলে পাঠরত রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের পেটভরা খাবারের একমাত্র ভরসা, সেই খাতেও রাজ্যের দেয় অংশে সামান্য টাকাও বাড়াল না তৃণমূল সরকার। এই বাজেটে মিড-ডে মিল কর্মীদের বিষয়ে কোনও উল্লেখই নেই।

তা ছাড়া ভোটের মরশুমে নতুন নানা প্রকল্প চালু করে ও পুরনো প্রকল্পে টাকা বাড়িয়ে জনমোহিনী সাজার যে চেষ্টা তৃণমূল সরকার করল, তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা কোথা থেকে আসবে, সে সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ কোনও হিসেবই কিন্তু মন্ত্রী দাখিল করলেন না বিধানসভায়। গত বাজেটে টাকার অভাবে বেশ কয়েকটি প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছিল সরকার। এ কথাও প্রকাশ্যে এসেছে যে, গত বছর অধিকাংশ দফতরকেই তাদের বরাদ্দের একটা ছোট অংশ হাতে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। বর্তমানে রাজস্ব ঘাটতি ও রাজকোষ ঘাটতি দুটির চেহারাই আশঙ্কাজনক। মোট ধারের পরিমাণও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ধার শোধ করতেই আয়ের বিপুল অংশ খরচ হয়ে যাচ্ছে। মোট আয়ের তুলনায় খরচের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। এই পরিস্থিতিতে এতগুলি নতুন ও পুরনো প্রকল্পের আর্থিক বোঝা সরকার কোন উপায়ে বহন করবে, সে সম্পর্কে বাজেট বক্তৃতায় একটি শব্দও নেই।

ফলে বুঝতে অসুবিধা নেই যে ভোটের মুখে এবারের বাজেট বক্তৃতা বাস্তবে গোটাটাই ফাঁকা বুলি। সাধারণ মানুষও আজ এ কথা বোঝেন। তাই বাজেট নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আজ আর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। এ কথা খুব ভালো করেই বোঝেন শাসক ও বিরোধী দলের নেতারাও। তাই বাজেট পেশের পরদিন বিধানসভায় বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা চাপা পড়ে গেল বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের হিন্দু-মুসলমান তরজায়।

এ দিন মাদ্রাসা শিক্ষায় বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আপত্তি তুলে মাদ্রাসা থেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার নয়, দুষ্কৃতী তৈরি হয় বলে গলা ফাটালেন এক বিজেপি বিধায়ক। শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। শিকেয় উঠল বাজেট আলোচনা। ফলে বোঝা যায়, শাসক অথবা বিরোধী— কোনও সংসদীয় রাজনৈতিক দলের ভাবনাতেই বাজেট জনসাধারণের কল্যাণসাধনের উপায় হিসাবে গণ্য হয় না।

এ সব দলের নেতা-নেত্রীদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হল ভোটে জেতা ও ক্ষমতা দখলে রাখা। তারই জন্য সমর্পিত তাঁদের যাবতীয় কার্যকলাপ। ফলে অন্যান্য বারের মতো এ বারের রাজ্য বাজেটের সঙ্গেও সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের দুর্দশা লাঘবের যথারীতি কোনও রকম সম্পর্ক নেই।

শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া বর্ণভিত্তিক বৈষম্য দূর হবে না

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ৯ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য দূর করার জন্য ইউজিসি রেগুলেশন সুপ্রিম কোর্টের আদেশে জারি করা হয়েছিল গত ১৩ জানুয়ারি। এটিকে ২০১২ সালের প্রায় একই ধরনের রেগুলেশনের একটি সম্প্রসারণ বলে মনে হয়েছিল। পুরনো রেগুলেশনে ৩ (সি) ধারাতে উল্লেখিত এসসি-এসটির সঙ্গে এবার ওবিসিকে যোগ করা হয়েছিল। এই ২০২৬ রেগুলেশন সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলে শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেছে। ফলে শীর্ষ আদালত তার নিজস্ব আদেশে জারি করা রেগুলেশন নিজেই স্থগিত করল। আশ্চর্যজনক বিষয় হল, আদালতে ইউজিসি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল আবেদনকারীদের যুক্তির বিরোধিতা করেননি। অর্থাৎ ইউজিসির আনা রেগুলেশনের পক্ষেই তিনি দাঁড়াননি।

এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমরা সব সময়েই সব ধরনের বৈষম্যের বিরোধিতা করি, যার মধ্যে জাত-বর্ণভিত্তিক বৈষম্যও অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের বৈষম্য রোধ করার জন্য কোনও বিল আনা হলে, আমরা অবশ্যই তা সমর্থন করব। তবে, কেবল এই ধরনের বিল বা আইন তৈরি করেই জাত-বর্ণভিত্তিক বৈষম্য দূর করা যাবে না। এটি নির্মূল করার জন্য শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার একটি প্রক্রিয়া থাকা উচিত। এর জন্য, সকলের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চালু এবং বিশেষ করে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ রূপে বাতিল করার দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমাদের দেশের জাত-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অবদান, সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকার কথা পড়ানো উচিত। এগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই প্রক্রিয়াতেই তারা জাত-বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং চরিত্র এবং মানবতার ভিত্তিতে একে অপরকে বিচার করতে শিখবে। তবেই প্রকৃত অর্থে জাত-বর্ণভিত্তিক বৈষম্য দূর হবে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি

একের পাতার পর

হচ্ছে ব্যাপক ভর্তুকিপ্রাপ্ত মার্কিন দেশের দুগ্ধজাত পণ্যের জন্য ভারতের দুগ্ধ শিল্প বাজারের দরজা খুলে দেওয়ার ফলে ভারতের ডেয়ারি ফার্মারদের ১.০৩ লক্ষ কোটি টাকা সম্ভাব্য ক্ষতি হবে। বর্তমানে ভারত সরকার দেশের ডেয়ারি ফার্মারদের রক্ষা করার জন্য দুগ্ধজাত পণ্য আমদানির উপর ৫৫ শতাংশ থেকে ৮১ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করে। এই চুক্তির ফলে এই ক্ষেত্রে কোনও আমদানি শুল্ক থাকবে না এবং এই পথ ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুগ্ধজাত পণ্য এ দেশের বাজার দখল করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সচিব উল্লসিত হয়ে বলছেন, এই চুক্তি তাঁদের বিরাট জয়। এর ফলে ভারতের বিরাট বাজারে মার্কিন কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আমেরিকার গ্রামীণ এলাকায় চাষিদের পকেটে ভালো পরিমাণ নগদ অর্থ ঢুকবে।

ভারতের কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান যতই বলুন না কেন ভারতীয় কৃষক এবং ডেয়ারি শিল্পকে সরকার রক্ষা করবে, মার্কিন আধিকারিকরা কিন্তু বলছেন, ভারত সরকার মার্কিন পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানো বা একেবারে তুলে দেওয়া এবং আমদানিকৃত কৃষিপণ্যের উপর অন্যান্য অ-শুল্ক বাধা তুলে দিতে সম্মত হয়েছে। কাজুবাদাম এবং পেস্তা বাদামের বাজার ভারতে সুবিস্তৃত এবং ২০২৪ সালে আমেরিকা থেকে ভারত ১.১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এইসব পণ্য আমদানি করেছে। আমেরিকা থেকে ডাল, যেমন মুসুর ডাল ও অন্যান্য হলুদ ডাল আমদানির ক্ষেত্রেও বর্তমান শুল্কের হার ৩০ শতাংশ আরোপ করা আছে। সেই শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হবে বা একেবারেই তুলে দেওয়া হবে। এর ফলে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ কতটা ভয়ানক হতে পারে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া এবং তার পরবর্তীকালে সমস্ত ধরনের তুলোর উপর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে শুরু করে একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনার ফলে বাজারে তুলোর দাম মারাত্মকভাবে কমে গেছে এবং ভারতীয় তুলো চাষিরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারত-মার্কিন চুক্তি দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজিকে কৃষিক্ষেত্রে বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দেবে। একই সাথে তা ভারতীয় কৃষকদের চরম বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে।

এই চুক্তি প্রতিরোধের ডাক দিয়ে এআইকেকেএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ৪ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী এই চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 27 Bengali Weekly February 13, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

শ্রমিক, কৃষক, নারীদের বাজেট প্রতিক্রিয়া

শ্রমজীবী জনগণকে ঠকানো হল

এ আই ইউ টি ইউ সি

২০২৬-'২৭-এর কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

শ্রমজীবী জনগণের প্রতি প্রতারণামূলক এই কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র নিন্দা করছে সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি। অন্যান্য বারের মতোই পরিসংখ্যানের বিভ্রম ও বড় বড় বুলির আড়ালে এ বারের বাজেটও সম্পূর্ণ ভাবে গরিব মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রকট উদাহরণ।

এখনকার টালমাটাল বিশ্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থনীতি ও শিল্প-পরিস্থিতির ভয়ানক চেহারা উঠে এসেছে বাজেট-পূর্ব আর্থিক সমীক্ষায়। কিন্তু এই সমীক্ষা রিপোর্টের সঙ্গে সামান্য সঙ্গতিও না রেখে এই বাজেট সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে, বিশ্বগুরু হওয়ার লক্ষ্যে এই দেশ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। এই বাজেট দেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যা নিয়ে একটি কথাও বলেনি, কথা বলেনি আশা, আইসিডিএস, মিড ডে মিল, এনআরএলএম-এর স্কিম-কর্মী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের দুর্দশা নিয়েও। দরিদ্র কৃষক ও খেতমজুরদের দুর্দশা দূর করার বিষয়েও এই বাজেট নীরব। নিপীড়িত জনগণের জীবন থেকে ভয়াবহ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করার কোনও কথা স্পষ্টতই এই বাজেটে উচ্চারণ করা হয়নি।

অন্য দিকে এই বাজেটে বেশ কিছু সুবিধা ও করছাড় দেওয়া হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংস্থাগুলিকে। একচেটিয়া সংস্থাগুলির জন্য সহজে ব্যবসা করার ব্যবস্থা আর ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জন্য সহজে মরার ব্যবস্থা করার যে মূল নীতি এই সরকার নিয়ে চলছে, তার সঙ্গে এই বাজেট অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবে আমাদের মতো পুঁজিবাদী সমাজের এটাই লক্ষ্য এবং লক্ষ্যপূরণের কার্যক্রম।

এই বাজেটকে সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যান করে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থবাহী কেন্দ্রীয় সরকারের নৃশংস নীতি ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এর পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে গোটা দেশের মেহনতি মানুষকে ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট সফল করার ডাক দেওয়া হয়েছে।

কৃষক-খেতমজুরের স্বার্থবিরোধী

এ আই কে কে এম এস

এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় কমিটি এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে কৃষক সহ মেহনতি মানুষের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী বলে মনে করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

কৃষক-খেতমজুরদের দাবি পূরণ দূরে থাক, এই বাজেটে তাঁদের দাবিগুলির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে কৃষিপণ্যের ন্যূনতম দাম ধার্য করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কৃষিপণ্য কেনা নিশ্চিত করা, ব্যাঙ্কঋণ মকুব, বীজ-সারের মতো কৃষি-উপকরণ কম দামে সরবরাহ করা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ বন্ধ করা ও বিদ্যুৎ বিল-২০২৫ প্রত্যাহার করা, সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা ও দৈনিক ৮০০ টাকা মজুরি ইত্যাদি দাবিতে কৃষক ও খেতমজুররা দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করছে। কারওরই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে চাষি ও খেতমজুরদের বাঁচাতে হলে এই দাবিগুলি পূরিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাজেট বরাদ্দ ও কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্ট যে, তারা এই সব দাবি পূরণ করতে চায় না। এমএনরেগার বদলে যে জিরামজি প্রকল্প চালু করা হচ্ছে, তার বিজ্ঞাপন বাবদ বিপুল খরচ করা হলেও ওই প্রকল্পের বরাদ্দ ৬৫.৯ শতাংশ ছাঁটাই করা হয়েছে। গত বাজেটের ৮৮ হাজার কোটির জায়গায় এবার বরাদ্দ করা হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। কৃষক ও খেতমজুরদের সম্পর্কে এই বাজেট সম্পূর্ণ নীরব।

পাশাপাশি দেশ ও বিদেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফা-লালসা নানা উপায়ে পূরণের লক্ষ্যে এবারের বাজেট বরাদ্দ স্থির করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে পুঁজিবাদী শোষণের ফলস্বরূপ জনসাধারণকে নিঃস্বে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া চলছে, এই বাজেট সেই প্রক্রিয়াকেই শক্তিশালী করবে। এর ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আরও গভীর হবে। এই অবস্থায় আমাদের অবশ্যকর্তব্য হল এই জনবিরোধী, কৃষকবিরোধী বাজেটের বিরোধিতা করা।

দেশ জুড়ে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের প্রতি শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা এবং শাসক শ্রেণি ও তার সেবাদাস বিজেপি সরকারের হীন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছে এআইকেকেএমএস।

মহিলাদের জন্য কিছু নেই

এ আই এম এস এস

কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে এআইএমএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীদের পক্ষে এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেট অত্যন্ত হতাশাজনক। অন্যান্য বারের মতো এ বারের বাজেটও মহিলাদের প্রকৃত প্রয়োজনগুলির প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে। এই বাজেট সামাজিক ন্যায়, লিঙ্গ সমতা এবং সমাজের নিপীড়িত অংশের সমস্যার মতো বিষয়গুলি এড়িয়ে গিয়েছে। সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই এই বাজেট মহিলাদের কল্যাণ, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক নিরাপত্তার উন্নতি বিধানের কোনও ব্যবস্থা করেনি। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে বিচার করলে সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে বাস্তবে বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও মিড ডে মিল-এর মতো মহিলা স্কিমকর্মীদের এ বারের বাজেটে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এআইএমএসএস সর্বস্তরের মহিলাদের এই কেন্দ্রীয় বাজেট প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছে।

বাজেট-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে। ৬ ফেব্রুয়ারি

মন্দির-মসজিদ রাজনীতি ও ভোট

এক সময়ে মন্দির উদ্বোধন করতেন, মসজিদের শিলান্যাস করতেন ধর্মীয় গুরুরা। এখন তাঁদের জায়গা দখল করে নিয়েছেন রাজনৈতিক নেতারা। রাজ্যে এ কাজ শুরু করেছিল বিজেপি, এখন এই বৃত্তে ঢুকে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক দখল-পুনর্দখলের লড়াইয়ে মন্দির-মসজিদ এখন তুরুপের তাস। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক নেতাদের মন্দির-মসজিদের শিলান্যাসে চাপা পড়ে যাচ্ছে মানুষের জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলো। রামমোহন বিদ্যাসাগরের সুমহান সংগ্রাম নবজাগরণের যে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়েছিল, তা নির্বাপিত হতে চলেছে। শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে মাটিগাড়ায় লক্ষ্মী টাউনশিপে গত ১৬ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সতেরো একর জমির উপর শিলান্যাস করলেন মহাকাল মন্দিরের। 'হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব' স্লোগান তুলে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। সেখানে শিবের যে মূর্তিটি গড়া হবে তা হবে ২১৬ ফুট উঁচু। আরও নানা মূর্তি, মন্দির, ধর্মীয় মিউজিয়াম হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দশ হাজার পুণ্যার্থী সমাগমের ব্যবস্থা থাকবে। ধর্ম পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে এই মন্দির বিশ্বের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হবে, একে ভিত্তি করে নতুন কর্মসংস্থান ঘটবে, অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

ঠিক এই ধরনের কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কয়েক বছর আগে অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করার সময় বলেছিলেন। তাতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি কতটুকু চাঙ্গা হয়েছে, কত কর্মসংস্থান হয়েছে সেটা সমীক্ষার বিষয়। কিছুদিন আগে দিঘাতেও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি টাকা খরচ করে জগন্নাথ মন্দির করেছেন। সেখান থেকে প্রসাদের প্যাকেট দলীয় কর্মীদের দিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছনোও হয়েছে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তরে ধর্মকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যও কিছু হতে পারে। কিন্তু এটাকে কর্মসংস্থানের তকমা দেওয়া কি মানুষকে ধোঁকা দেওয়া নয়?

মন্দির নির্মাণের এই প্রতিযোগিতার মধ্যেই মুর্শিদাবাদে কয়েক মাস আগে শিলান্যাস হল বাবরি মসজিদের। ধর্মীয় ধারণা অনুযায়ী ৩৩ কোটি দেবদেবীর দেশে মন্দিরের কোনও অভাব সাধারণ মানুষ কখনও অনুভব করেননি। এলাকায় এলাকায় অজস্র মসজিদ। তারও অভাব জনসাধারণের মধ্যে খুব একটা লক্ষ করা যায়নি। অথচ দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা ধর্মকে রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম করে ফেলছেন। একদা বিজেপি করা, সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করলেন। এই মসজিদ নির্মাণের দাবি জনসাধারণের থেকে আসেনি, মন্দির নির্মাণের দাবিও জনসাধারণের থেকে ওঠেনি। এই প্রতিযোগিতার সিকি ভাগ আয়োজন যদি হত উত্তরবঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতিতে, মানুষ খুশি হত।

উত্তরবঙ্গে জরুরি এইমস-এর মতো উন্নত মানের হাসপাতাল। কিন্তু সেটা হয়নি। উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার প্রান্ত-প্রত্যন্ত থেকে চিকিৎসার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষকে কলকাতায় ছুটে আসতে হয়। চিকিৎসার এই যে দুর্ভোগ, তার অবসানের জন্য জরুরি ছিল উত্তরবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলির সার্বিক উন্নতি। কিন্তু তার কোনও তৎপরতা উত্তরবঙ্গ থেকে বহু আসনে বিজয়ী বিজেপির সাংসদ, বিধায়কদের যেমন দেখা যাচ্ছে না, তেমনি অদৃশ্য মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও। কেন্দ্রের বিজেপি, রাজ্যের তৃণমূল প্রতিযোগিতা করে উন্নয়নের দিকে নজর দিলে কোনও প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু প্রতিযোগিতা করে কে কত বড় হিন্দু, তা দেখাতে যে ভাবে মন্দির রাজনীতির আগল খুলে দেওয়া হচ্ছে, তাতে ভক্তি না ভোট, কোনটা প্রধান, এ প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠছে।

কারণ শিলান্যাসের সময় নির্বাচনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। তারপরে বিধানসভা ভোট। এই প্রেক্ষাপটে মন্দির, মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাস বিশেষ অর্থবহ। মন্দির নির্মাণের লক্ষ্য যেমন হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সংহত করা, তেমনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করার লক্ষ্য মুসলিম ভোট সংহত করা। তৃণমূলের এই মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরাতেই যে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস, তা বোঝা কঠিন নয়।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com